প্রসঙ্গ রামায়ণ

স্বামী সুহিতানন্দ

[পরমপূজনীয় মহারাজ তাঁর অতি ব্যস্ততা সত্ত্বেও, আমরা আবেদন জানানো মাত্র মৌলিক ভাবসমৃদ্ধ এই রচনাটি স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন। সানন্দে স্মরণ করি, রামায়ণের এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য তাঁর লেখাটিই প্রথম নিবোধত দপ্তরে পৌঁছেছে।—সঃ]

শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে সাধারণত দুটি অভিযোগ প্রধান—বালীবধ এবং সীতার বনবাস। কথামৃতে এর উল্লেখ আছে এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের দেওয়া এর উত্তরও আছে (২২ অক্টোবর ১৮৮৫)। তিনি বলেছেন, ''একাজ ঈশ্বরই পারেন, মানুষ পারে না।'' কীভাবে?

সাধারণত অবতার ঈশ্বরস্বরূপ হলেও মায়ার রাজ্যে হস্তক্ষেপ করেন না। তাঁর সংস্পর্শে আসা জীবের জীবনেও তিনি নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে ক্রিয়া হতে দেন; তাঁর অবতারলীলার সার্থকতা হল ঘটনা ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। সুগ্রীব ও বালীর পরস্পর শত্রুতা। বালীর কাছে সুগ্রীব পরাস্ত হয়েছেন। তিনি রামচন্দ্রের শরণাগত, শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছেন। শরণাগতকে রক্ষা করতেই হবে যেভাবেই হোক—এমনকী তাতে তিনি নিজে হীন প্রতিপন্ন হলেও—রামচন্দ্রের মনোভাব এই। যেমন মা সন্তানের জন্য প্রাণবিসর্জন দেন। রাম কি জানতেন না—নীতিগতভাবে তাঁর কার্য সম্মত নয়? তথাপি ভক্তের কল্যাণে অপবাদ মাথায় তুলে নিলেন তিনি।

সীতাকে রাম যতটা চিনতেন, নিশ্চয়ই আর কেউ এতটা জানতেন না। আধ্যাত্মিক দিকটি ছেড়ে দিলেও, জাগতিক দিক থেকেও সীতা রামময়-জীবিতা। রামও সীতা বিহনে কেমন শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন, সীতাহরণের পর তাঁর বিলাপে বোঝা যায়। এমন অকলঙ্ক সীতাকে রাম কেন বনবাস দিলেন? যদি একটি বিচারসভার কল্পনা করি—একদিকে জনমত, অপরদিকে এক সচ্চরিত্র ব্যক্তি রাম। রাজা রাম বিচারক। ব্যক্তি রাম সীতাকে চেনেন কিন্তু বিচারক রাম তো নিরপেক্ষ। এখনকার দিন হলে আরও ঘটনার অন্বেষণ করতে পারতেন কিন্তু তখন তা সম্ভব ছিল না। অথচ বিচারককে বিচারফল জানাতে হবে তখনই। প্রথমত বিচারক হিসাবে

পরমপূজ্যপাদ সহসঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

নিরপেক্ষতা প্রয়োজন, তাছাড়া অবতারের প্রতিটি লীলা জগৎকল্যাণের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য। তাই ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে প্রজাস্বার্থকে রাখলেন তিনি। এই অস্বাভাবিক বিচার অবতারের পক্ষেই সম্ভব।

অবতার সাধারণত বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা এবং অন্তর্দশাতে থাকেন—গীতাতে যাকে শ্রীভগবান ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম অবস্থা বলেছেন। সাধকের জীবনে ক্ষর অবস্থা থেকে প্রায় অক্ষর পর্যন্ত সম্ভব, পুরুষোত্তমে পৌঁছনো পর্যন্ত শরীর থাকে না। কিন্তু অবতার এই তিন অবস্থার মধ্যে যাতায়াত করতে পারেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'রাজার ব্যাটা', নিজ ভবনের সর্বত্র যাওয়ার অধিকার তাঁদের আছে। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত প্রভৃতি চরিত্র অনুধাবন করতে গেলে এই তত্ত্বটি জানা বিশেষ প্রয়োজন।

মনুষ্য অবতাররূপে প্রথম আমরা পাই রামচন্দ্রকে। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ প্রমুখ তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন যার অনুকরণ সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত, কবির সাধকের কল্পনার অতীত। তাই রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, হনুমান চিরকালের জন্য আদর্শ—যুগ যুগ ধরে দেশকালের গণ্ডি ভেঙে এই চরিত্রগুলি মানবসভ্যতা সৃষ্টি করে চলেছে। শ্রীরামচন্দ্রের কালে ব্যক্তিগত জীবনই ছিল মার্গ—কোনও ধর্মসম্প্রদায় বা গোষ্ঠী নয়।

আমরা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলি; কারণ তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরের চৈতন্যশক্তি নিরায়াসে বর্তমান থাকে। অনেকটা বায়ু, আলো এবং জলের মতো। রামায়ণ যদি বাল্মীকির কল্পিত রচনাও হয়, নিশ্চয়ই তিনি কোনও চরিত্রকে দেখেই কল্পনা করেছেন। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত প্রভৃতি চরিত্রগুলি এমন উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন যে বাল্মীকি প্রভৃতির দৃষ্টিতে তাঁরা আদর্শরূপে জনমানসে অবস্থান করছিলেন। মনের কোন অবস্থায় থাকলে এইভাবে লীলা করা যায় তার নমুনা আমরা পাই শ্রীরামকৃষ্ণ-মা সারদা-বিবেকানন্দ চরিত্রে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজীর রূপ ও লীলা ঐতিহাসিক সত্য। শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক চরিত্র ধরে নিলে দেখতে পাই রূপ, গুণ, লীলা, শৌর্যবীর্যে তিনি জীবৎকালেই ভগবানরূপে পূজিত হচ্ছেন। ভগবানের লীলায় অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা, বাহ্যদশা থাকবেই। হরিবংশে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যদশা অর্থাৎ ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে আবির্ভূত হয়েছেন তার প্রকাশ। কিন্তু তাঁর গবেষণাগার কোথায়? বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে তিনি যে-ঈশ্বরলীলা করেছেন, শ্রীচৈতন্য সেই লীলা গম্ভীরাতে আস্বাদন করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণও সেই লীলাই আস্বাদন করেছেন এবং স্বয়ং একই লীলা করেছেন। ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের ভাব, মহাভাব, মহাপ্রেমের লক্ষণ প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণজীবনের মূল ভিত্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদত্ব—তা তিনি কুরুক্ষেত্রেই থাকুন, প্রভাসতীর্থে বা দ্বারকাতেই থাকুন—এটিই তাঁর স্বকীয় সত্তা, বাকিটুকু অবতারলীলা।

তুলনামূলকভাবে রামচন্দ্রের জীবনের ভাষ্যকার লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, বিশ্বামিত্র বা বশিষ্ঠ নন। তাঁরা রামলীলার সহচর। বাল্মীকি কে ছিলেন, কবে ছিলেন—রামের আগে না পরে—জানা নেই। যদি রামচরিত্রের কোনও ব্যাখ্যাতা থাকেন তিনি বাল্মীকি। চোখের সামনে কোনও জীবন না থাকলে কোনও মানুষের পক্ষে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-ভরতের কল্পনা করা সম্ভব নয়। তাই মনুষ্যবুদ্ধি আমাদের বাধ্য করে ভাবতে যে, বাল্মীকির আবির্ভাবের পূর্বেই রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-ভরতের লীলাময় জীবন সমাজ দেখেছে। হয়তো সেসব জীবনের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির, সাধকের কল্পনা মিশেছে—যেমন পরে কৃত্তিবাসের ও তুলসীদাসের রামায়ণ, কম্ব রামায়ণ

প্রভৃতিতে। ওই চরিত্রগুলি এতই সার্বকালিক যে সেগুলি গান-কথকতা-সাহিত্য-শিল্পের মধ্য দিয়ে দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিভিন্ন দেশের ভাব-ভাষা-জীবন-সাহিত্যে মিলেমিশে এক নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন গীতা বলছিলেন তখন কি তাঁর চোখের সামনে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-ভরত বর্তমান ছিলেন? তিনি কি শিশুকাল থেকে রামায়ণের কাহিনি শুনে এসেছেন? ''অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।/সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥/ তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ''—গীতার এইসব শ্লোকের উপলক্ষ্য কে? রামায়ণে রামচন্দ্রাদির সাধনা, অনুভূতি, মহাভাব, প্রেমের কোথাও কোথাও ইঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। তখন সমাজের প্রয়োজন ছিল এক লোকোত্তীর্ণ জীবন। সমাজ-সভ্যতা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ—এই অপরূপ চরিত্রগুলি সামনে পেয়ে এসব চরিত্রের মাধ্যমে রামাদি চরিত্রের বিশুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বরসত্তা খুঁজে পেয়েছেন।

কথামৃতে দেখি, রামচন্দ্রের যখন চরম বৈরাগ্য তখন দশরথ বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বললেন, ''যদি জগৎ ঈশ্বরছাড়া হয় তবে তুমি তাকে ত্যাগ করতে পার।'' রাম দেখলেন, যে-জিনিসে ছাদ তৈরি সেই চুনসুরকিতে সিঁড়িও তৈরি। চোখ বুজলে যিনি চোখ চাইলেও তিনি। তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ আবার তিনিই 'স্বাম্ প্রকৃতিম্ আশ্রিত্য' এই জগৎ সৃষ্টি করে জগৎলীলা করছেন। তাই তিনি ব্রহ্ম, সৃষ্টি, অবতার, লীলা—সব একসঙ্গে দেখেন। শ্রীকৃষ্ণও আত্মযোগে থেকেই লীলা করেছেন। চৈতন্যদেবেরও এই অবস্থায় চিরবর্তমান থেকেই নবদ্বীপলীলা, গম্ভীরালীলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও সেই জল। তাঁরও সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থিত থেকেই কামারপুকুর লীলা, দক্ষিণেশ্বর লীলা, কাশীপুর লীলা। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের রোগযন্ত্রণার সময় হরিনাথ দিব্যচক্ষে দেখেছিলেন তিনি অসীম আনন্দের সাগর। একথা জেনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ''শালা ধরে ফেলেছে!'' রামচন্দ্রও কখনও বিস্মৃত নন যে তিনি সচ্চিদানন্দ। অযোধ্যালীলা, তাড়কাসুরবধ, বনবাস, সীতাহরণ, রাবণবধ, সীতার বনবাস, সরযূতে মহাপ্রস্থান—সব লীলাই সচ্চিদানন্দ স্বরূপে থেকে। অবতারের এই উত্তুঙ্গ আধ্যাত্মিক সত্তাই স্বাভাবিক সত্তা, তাতেই জলের মধ্যে তরঙ্গের মতো লীলা হয়।

প্রেমেশানন্দজী মহারাজ একটি রচনা মুখে মুখে বলে যেতেন, সেবকরূপে আমি লিখে নিতাম—'অবতারতত্ত্ব'। তাতে তিনি বলেন, অবতারের তিনটি অবস্থা—ব্রহ্ম ক্ষররূপে জীব, অক্ষররূপে সমষ্টি এবং পুরুষোত্তমরূপে স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। এমন নয় যে একটিতে যখন আছেন তখন অন্যটিতে তিনি নেই। তাঁতে স্থান-কাল কার্য-কারণ থাকে না। তিনি সর্বদা সমরস, আমাদের সংস্কারের ভিন্নতার জন্য আমরা তাঁর বিভিন্ন স্বরূপ দেখি। শ্রীশ্রীমা যেভাবে ঠাকুরকে দেখতেন স্বামীজী সেভাবে নয়, আবার স্বামীজী যেভাবে দেখতেন অন্য গুরুভাইদের পক্ষেও তা সম্ভব হত না।

হঠাৎ সূর্য উঠলে যেমন তমোনাশ হয়, তেমনি রামাদি চরিত্রের উদয়ে মানবসভ্যতা এতটাই আলোকিত যে আজও সে এমন একটি চরিত্র কল্পনা করতে পারে না। এটিই রামচরিত্রের বিশেষত্ব। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় আমাদের হৃদয়ে রামবুদ্ধি উদিত হোক—এই প্রার্থনা।